ন্যায়সম্মত প্রমা ও প্রমাণের স্বরূপ

দর্শন শাস্ত্রে প্রমাণ রহস্য যেমন গভীর তেমনই দুর্জ্ঞেয়। কিন্তু তা দর্শন শিক্ষার্থীর অবশ্য শিক্ষণীয়ও বটে। প্রমাণের সাহায্যে প্রমেয়ের প্রতিপাদনই দর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রমাণ না জানলে প্রমেয়তত্ত্বকে জানার কোন বিকল্প উপায় নাই। আর এই জন্যই ভারতীয় দার্শনিকগণ তাঁদের দর্শনে প্রমা ও প্রমাণ সম্পর্কে এত বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

সকলেই প্রমা বা যথার্থ এই জ্ঞানের অস্তিত্ব তথা মহিমা একবাক্যে স্বীকার করেন। এই জ্ঞানের জন্যই জড় ও চেতনের বিভাগ সম্ভব হয়। জ্ঞানই ঘট, পটাদি থেকে প্রাণীকে উচ্চাসন দান করেছে। এই জ্ঞান মানুষের প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর। জ্ঞানহীন জীবিতাবস্থা কেউই চায় না। জ্ঞান ব্যতীত কেউই একটি পদবিন্যাসও করতে পারে না। দার্শনিক তো জ্ঞানকে দার্শনিকতার ধারক, বাহক, বর্ধক প্রভৃতি বলে মনে করেন। আলোক যেমন জগৎকে আমাদের নিকট প্রকাশিত করে, তেমনি জ্ঞান আমাদেরকে জগৎকে জানতে সাহায্য করে। এহেন জ্ঞানকে বা তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা আমাদের কারুর পক্ষে সম্ভব নয়। অস্বীকার করতে হলে তা জ্ঞানের সাহায্যে অর্থাৎ যুক্তির সাহায্যে করতে হবে। যার অর্থ প্রকারান্তরে জ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করে নেওয়া। নব্য নৈয়ায়িক অন্নংভট্ট তাঁর তর্কসংগ্রহ গ্রন্থে তো জ্ঞানকে সর্বব্যবহারের হেতু বা কারণ বলে স্বীকার করেছেন। আবার তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেন, যথার্থ জ্ঞানের সাহায্যে সত্য বা তত্ত্বকে জানার মাধ্যমে মোক্ষ বা মুক্তি সম্ভব হয়। কিন্তু জ্ঞানের অস্তিত্ব সর্বসম্মত হলেও তার স্বরূপ নিয়ে দার্শনিক মহলে মতানৈক্য লক্ষ্য করা যায়।

নৈয়ায়িকমতে, কেবল প্রমাণের সাহায্যেই সত্য বা তত্ত্বের জ্ঞান লাভ করা যায় এবং তার দ্বারাই নিঃশ্রেয়স বা অপবর্গ লাভ করা সম্ভব। যে প্রমাণ তত্ত্ব এ হেন গুরুত্বপূর্ণ কার্যটি করতে পারে সেই 'প্রমাণ' শব্দটি নিঃস্পন্ন হয়েছে প্র-পূর্বক মা ধাতুর উত্তর করণবাচ্যে ল্যুট্ বা অনট্ প্রত্যয় করে। প্র-পূর্বক মা ধাতুর অর্থ প্রকৃষ্ট বা যথার্থ জ্ঞান। আর ল্যুট্ প্রত্যয়ের দ্বারা করণকে বোঝায়। এককথায় প্রকৃষ্ট বা যথার্থ জ্ঞান লাভের উপায় বা করণকে প্রমাণ বলা হয়। তবে এই যথার্থ জ্ঞান কি তা নিয়ে ভারতীয় দার্শনিকদের মধ্যে মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। অধিকাংশ ভারতীয় দার্শনিকদের মতে যে পদার্থ যেরূপ, সেরূপে তা জ্ঞানের বিষয়ীভূত হলে, সেই জ্ঞানকে প্রমা বা যথার্থ জ্ঞান বলে। যেমন এই প্রসঙ্গে নব্য নৈয়ায়িক তত্ত্বচিন্তামণিকার গঙ্গেশোপাধ্যায়ের বক্তব্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

তিনি বলেন, ‘যথার্থানুভবঃ প্রমা, যত্র যদস্তি তত্র তস্যানুভবঃ প্রমা, তদ্‌বতিতৎপ্রকারানুভবো বা’। তর্কসংগ্রহকার বলেন, ‘‘তদ্বতি তৎপ্রকারকঃ অনুভবো যথার্থঃ’’। কিন্তু অদ্বৈত বেদান্তীগণ একটু ভিন্ন ধরণের প্রমার লক্ষণ দেন। ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র এই প্রসঙ্গে প্রমার লক্ষণ দিতে গিয়ে বলেন, ‘‘প্রমাত্বমনধিগতাবাধিতার্থবিষয়কজ্ঞানত্বম্’’ অর্থাৎ অনধিগত অবাধিত অর্থ বিষয়ক জ্ঞানকে প্রমা বলে। প্রমার লক্ষণ এরূপ হলে স্মৃতি আর কখনোই প্রমা বলে গৃহীত হবে না। কারণ স্মৃতি পূর্ব অধিগত জ্ঞান। তবে ন্যায় সম্মত লক্ষণটি স্বীকার করলেও স্মৃতিকে প্রমা বলা যাবে কিনা তা নিয়ে বিতর্ক আছে।

প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ কেউই স্মৃতিকে প্রমার মর্যাদা দান করেন নি। উদয়নাচার্য তাঁর ন্যায়কুসুমাঞ্জলির চতুর্থ স্তবকের প্রথম শ্লোকে বলেন, ‘‘যথার্থ অনুভবই প্রমা’’। অবাধিত বিষয়ে উৎপন্ন স্মৃতিজ্ঞান যথার্থ হলেও তা অনুভূতি নয় বলে প্রমা হবে না। উদ্দ্যোতকর তাঁর ন্যায়বার্তিকে এবং বাচস্পতি মিশ্রও তাঁর ন্যায়বার্তিকতাৎপর্যপরিশুদ্ধি টীকাতে স্মৃতি ভিন্ন যথার্থ জ্ঞানকে প্রমা বলেছেন। তাঁদের মতে, স্মৃতি যথার্থ হলেও প্রমা পদবাচ্য নয়।

সাংখ্য, মীমাংসা প্রভৃতি দর্শনেও স্মৃতিকে প্রমার মর্যাদা দেওয়া হয় নি। প্রাচীন মীমাংসক প্রাভাকর স্মৃতিকে প্রমা বলে গ্রহণ করেন নি।

প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ যাঁরা স্মৃতিকে প্রমা বলে স্বীকার করেন নি, তাঁদের যুক্তি হল প্রত্যক্ষ, অনুমিতি আদি প্রমার যেমন স্বতন্ত্র প্রমাণ(প্রত্যক্ষ, অনুমান ইত্যাদি) আছে, তেমনি স্মৃতিরও স্বতন্ত্র প্রমাণ স্বীকার করতে হবে। তখন ন্যায়সূত্রকারের সহিত বিরোধ হবে। কারণ সূত্রকার চার প্রকার প্রমা(প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি ও শাব্দ) ও এদের করণ চার প্রকার প্রমাণ(প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ) স্বীকার করেছেন। এই ভেবেই প্রচীন নৈয়ায়িকগণ স্মৃতি ভিন্ন যথার্থ অনুভবকে প্রমা ও তার করণকে প্রমাণরূপে অভিহিত করে স্মৃতির প্রমাত্ব খণ্ডন করেছেন।

তবে মুক্তাবলীকার বিশ্বনাথের মতে, স্মৃতি প্রমা হলেও তার স্বতন্ত্র করণ স্বীকার করতে হবে এমন কোন যুক্তি নাই। কারণ প্রমার যা করণ, তাকেই প্রমাণ বলতে হবে এমন নয়। পরন্তু যথার্থ অনুভবের যা করণ, তাই প্রমাণ - যদি এভাবে প্রমাণের লক্ষণ নির্ধারণ করা যায়, তাহলে আর কোন সমস্যা হবে না। কেননা স্মৃতি প্রমা হলেও স্মৃতি অনুভব হতে ভিন্ন স্তরের জ্ঞান হওয়ায় স্মৃতির করণকে প্রত্যক্ষ, অনুমানাদির ন্যায় স্বতন্ত্র প্রমাণ বলা চলে না।

এখন প্রমা লক্ষণে ‘অনধিগত’ বা অজ্ঞাত পদার্থের বোধক পদটি থাকলে ধারাবাহিক প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ক্ষেত্রে অব্যাপ্তি দোষের আশঙ্কা লক্ষ্য করে কোন কোন নৈয়ায়িক ‘অনধিগত’ পদটিকে প্রমা লক্ষণের অন্তর্গত করেন নি। আবার মুক্তাবলীকার বিশ্বনাথ প্রমুখ দার্শনিক যাঁদের স্মৃতিকে প্রমা বলতে কোন আপত্তি নেই, তাঁরা প্রমাকে অজ্ঞাত পদার্থের বোধক কখনোই বলেন না। কিন্তু উদ্যোতকর, বাচস্পতি মিশ্র প্রমুখ যাঁরা স্মৃতিকে প্রমা বলেন না, তাঁরা ধারাবাহিক প্রত্যক্ষকে জ্ঞাত পদার্থের বোধক বললেও ঐ প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে অপ্রমা বলেন না। কারণ প্রমাকে যে অনধিগত বা অগৃহীতগ্রাহী বা অজ্ঞাত পদার্থের বোধক বলতে হবে এমন কোন মত প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ স্বীকার করেন না।

প্রাচীন নৈয়ায়িক জয়ন্ত ভট্টের মতে, যে জ্ঞানের জ্ঞেয় বিষয়টি পরবর্তী অন্য কোন জ্ঞানের দ্বারা বাধিত হয় না; সেই জ্ঞান প্রমা। তাঁর মতে অগৃহীতগ্রাহী প্রত্যক্ষের ন্যায় গৃহীতগ্রাহী ধারাবাহিক প্রত্যক্ষের বিষয়বস্তুও কখনও বাধিত হয় না। তাই তা প্রমাও বটে।

কিন্তু এখানে একটি প্রশ্ন দেখা দেয়। গৃহীতগ্রাহী হলে প্রত্যক্ষ যদি প্রমা হয়, তাহলে স্মৃতির প্রমা হতে আপত্তি কোথায়। উত্তরে জয়ন্ত ভট্ট বলেন, স্মৃতি গৃহীতগ্রাহী বলে তাকে অপ্রমা বলা হয় এমন নয়। প্রকৃতপক্ষে স্মৃতির বিষয় স্মৃতির সময় স্মরণ কর্তার সম্মুখে উপস্থিত থাকেনা বলে স্মৃতিকে অপ্রমা বলা হয়। কিন্তু গৃহীতগ্রাহী প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে বিষয় জ্ঞাতার সম্মুখে উপস্থিত থাকে। যদি স্মৃতির বিষয় স্মৃতির সময় স্মরণ কর্তার সম্মুখে উপস্থিত থাকত, তাহলে তাকে স্মৃতি না বলে প্রত্যক্ষ বলতে হত। অনুপস্থিত স্মৃত বিষয়টিকে স্মৃতি উৎপত্তির কারণও বলা চলে না। একমাত্র ঐ বিষয়ের পূর্ববর্তী সংস্কারই কারণ।

এখানে কেউ যদি আপত্তি করেন, স্মৃতির বিষয়বস্তু স্মরণ কর্তার সম্মুখে উপস্থিত থাকে না বলে যদি স্মৃতি অপ্রমা হয়, তাহলে অনুপস্থিত বিষয় সম্পর্কে আমরা যে অনুমান করি তাও কি অপ্রমাণ হবে? উত্তরে জয়ন্ত ভট্ট বলেন, আমাদের অনুমিত বিষয় অর্থাৎ সাধ্যধর্মটি অনুমাতার নিকট উপস্থিত থাকে না ঠিকই, কিন্তু ধর্ম বা সাধ্যটি যে ধর্মী বা পক্ষে উপস্থিত থাকে সেই পক্ষটি উপস্থিত থাকে। পক্ষে সাধ্যধর্মের সাধনই তো অনুমান। পক্ষকে বাদ দিয়ে অনুমান সম্ভব নয়। এই অবস্থায় অতীত বা ভাবী বিষয় সম্পর্কে যে অনুমান তা স্মৃতির ন্যায় সম্পূর্ণ বিষয় নিরপেক্ষ এটি বলা চলে না। তাই অনুমানকে প্রমাণ বলতে কোন বাধা নাই।

ন্যায়সূত্রকার মহর্ষি গৌতম যে ষোলটি পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানের মাধ্যমে সাক্ষাৎ বা পরম্পরাক্রমে নিঃশ্রেয়স বা অপবর্গ লাভ সম্ভব বলে মনে করেন তন্মধ্যে প্রমাণ প্রথম পদার্থ। তিনি প্রমাণের সরাসরি কোন সামান্য লক্ষণ না দিয়ে তার বিভাগ সূত্রের অবতারণা করেছেন। তিনি বলেন, ‘প্রত্যক্ষানুমানোপমানশব্দাঃ প্রমাণানি’। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ এই চারটি প্রমাণ। তবে আপাতদৃষ্টিতে সূত্রকার প্রমাণের কোন সামান্য লক্ষণ দেননি মনে হলেও তিনি কিন্তু সূত্রোক্ত ঐ ‘প্রমাণ’ শব্দের দ্বারাই তার লক্ষণ দিয়েছেন বলে পরবর্তীকালে টীকাকারগণ দাবী করেন। প্রকৃতপক্ষে যদি কোন সূত্রে ব্যবহৃত কোন শব্দের দ্বারা ঐ শব্দের লক্ষণটি বোঝা যায়, তাহলে সেক্ষেত্রে তার লক্ষণ দেওয়া বাহুল্যমাত্র।

ন্যায়সূত্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এরকম দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। যেমন মহর্ষি গৌতম তাঁর ন্যায়সূত্রের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকের ৪৫ নং সূত্রে হেত্বাভাসের কোন লক্ষণ না দিয়ে সরাসরি বিভাগ সূত্রের আবতারণা করেছেন।(সব্যভিচার-বিরুদ্ধ - প্রকরণসম-সাধ্যসম-কালাতীতা হেত্বাভাসাঃ) বাচস্পতি মিশ্র এই প্রসঙ্গে বলেন, প্রমাণের উক্ত বিভাগ সূত্রে উল্লিখিত ‘প্রমাণ’ শব্দের দ্বারা সূত্রকার প্রমাণের সামান্য লক্ষণই সূচিত করেছেন। কারণ সূত্রের দ্বারা বহু অর্থ সূচিত হয়, এইজন্যই উহাকে সূত্র বলে। বাচস্পতি মিশ্র অন্যত্রও বলেছেন, ‘‘সূত্রঞ্চ বহ্বর্থসূচনাদ্ভবতি’’।(ভামতী, আদিভাষ্যশেষ টীকা) ন্যায়মঞ্জরীকার জয়ন্তভট্টও উক্ত বক্তব্য সমর্থন করে বলেন, ‘একেনানেন সূত্রেণ দ্বয়ঞ্চাহ মহামুণিঃ। প্রমাণেষু চতুঃসংখ্যা তথা সামান্যলক্ষণম্’। অর্থাৎ একটি সূত্রের দ্বারা সূত্রকার প্রমাণ চার প্রকার ও প্রমাণের সামান্য লক্ষণ উভয়ই দিয়েছেন।

তাই পূর্বোক্ত যে প্রমা-জ্ঞান তা বলতে কেবল যথার্থ অনুভবকে বোঝাবে এবং তার করণই প্রমাণ হবে। তত্ত্বচিন্তামণিকারও তদ্বতি তৎপ্রকারকত্বকে প্রমা বলে সেই প্রমার করণকেই প্রমাণের সামান্য লক্ষণ বলেছেন। ফলে যথার্থ অনুভবই প্রমা এবং তার করণই প্রমাণ এটাই স্বীকার্য। এটাই বোঝাতে ন্যায়সূত্রের ভাষ্যকার বাৎসায়ন তাঁর ভাষ্য বিবৃতিতে বলেন, ‘উপলব্ধিসাধনানি প্রমাণানি’ অর্থাৎ উপলব্ধি বা প্রমার করণত্বই প্রমাণ। প্রমাণের স্বরূপ আলোচনা করতে গিয়ে বার্ত্তিককার বলেন, ‘উপলব্ধিহেতুঃ প্রমাণং, উপলব্ধি হেতুত্বং প্রমাণত্বং’ অর্থাৎ উপলব্ধির যে হেতু অর্থাৎ করণ তাই হল প্রমাণ। তবে জয়ন্তভট্ট প্রমুখ নৈয়ায়িক যে প্রমাতা এবং প্রমেয়কেও প্রমাণ বলে উল্লেখ করেছেন তা খণ্ডন করতে গিয়ে বার্ত্তিককার বলেন, উপলব্ধির যা সাধকতম কারণ (অর্থাৎ যে কারণটি উপস্থিত হলে কার্যটি সংঘটিত হয়) তাই হল করণ এবং তা বলতে কেবল প্রমাণকে বোঝায়। আর প্রমাতা বা জ্ঞাতা এবং প্রমেয় বা জ্ঞেয় বিষয় হল কারণ, কিন্তু করণ নয়।

সহজ কথায় এগুলি সাধকতম নয় বলে প্রমাণরূপে গণ্য হবে না। সুতরাং যথার্থ অনুভবের করণকেই প্রমাণ বলতে হবে। মহর্ষি গৌতম প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি ও শাব্দ নামক চার প্রকার যথার্থ অনুভব স্বীকার করেছেন। তাই এঁদের মতানুযায়ী সাধকতম কারণ উক্ত চার প্রকার অর্থাৎ প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দই হবে।

কিন্তু ন্যায়মঞ্জরীকার জয়ন্তভট্ট একটু ভিন্ন দৃষ্টকোণ থেকে প্রমাণের লক্ষণ ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন, ভ্রম ভিন্ন এবং সংশয় ভিন্ন যে বস্তুর অনুভূতি, তার সাধক অথচ জ্ঞান এবং জ্ঞান ভিন্ন উভয় প্রকার পদার্থ ঘটিত যে সমষ্টি, তাকে প্রমাণ বলে। কেবল জ্ঞানও প্রমাণ নয়। আবার কেবল ইন্দ্রিয় প্রভৃতি জড়বস্তুও প্রমাণ নয়। বোধ ও অবোধ অর্থাৎ জ্ঞান ও জ্ঞান ভিন্ন দ্বিবিধ বস্তুকে নিয়ে গঠিত যে প্রমা বা যথার্থ জ্ঞানের কারণ সমষ্টি, সে সমষ্টিই প্রমাণের স্বরূপ।

কিন্তু অন্যান্য প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ কারণ সামগ্রীর প্রমাণতা স্বীকার করেন নি। ভাষ্যকার বাৎসায়ন বলেন, প্রমাতা যার দ্বারা পদার্থকে যথার্থরূপে জানে, তাই হল প্রমাণ। তিনি বলেন, প্রমাণ অর্থবৎ হলে অর্থাৎ অর্থের বা বিষয়ের অব্যভিচারী হলে প্রমাণের সাথে যুক্ত প্রমাতা, প্রমিতি ও প্রমেয় এই তিনটিও অর্থের অব্যভিচারী হয়। এখানে অব্যভিচারী বলতে প্রমাণ যে পদার্থকে যে রূপে ও যে প্রকারে জানিয়ে দেয়, সেই পদার্থ সেই রূপ ও সেই প্রকারই হয়। কখনই তার অন্যথা হয় না। এটাই বোঝায়। তাৎপর্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র এই প্রসঙ্গে বলেন, গ্রহণ, বর্জন ও উপেক্ষা বুদ্ধি বিষয়ের যে স্বরূপ এবং প্রকার বা বিশেষণ যা প্রমাণের দ্বারা বোঝা যায়, তা যদি দেশ, কাল ও অবস্থাভেদে অপরিবর্তিত থাকে, তবে তাই প্রমাণ এবং তা অর্থের অব্যভিচারী।

তবে সাধকতম কারণ(শ্রেষ্ঠ কারণ) বা করণ কি হবে তা নিয়ে প্রাচীন ও নব্য নৈয়ায়িকদের মধ্যে মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। নব্যদের মতে যে কারণের ‘ব্যাপারের’ পরেই কার্য উৎপন্ন হয়, তাকেই কারণ সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কারণ বা ‘করণ’ বলতে হবে। আমার চক্ষু ইন্দ্রিয় আছে, টেবিলে বইটিও আছে। কিন্তু যতক্ষণ না বইটির সহিত আমার চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সংযোগ স্থাপিত হচ্ছে, ততক্ষণ আমি বইটিকে দেখতে পাব না। এক্ষেত্রে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সাথে বইটির সংযোগই চক্ষুরিন্দ্রিয়ের ব্যাপার বা কার্য। করণ পদার্থটি কার্য সম্পাদনের জন্য ঐ কার্য সিদ্ধির অনুকূল অপর যে একটি কার্যকে অপেক্ষা করে, সেই মধ্যবর্তী কার্যটিকে ব্যাপার বলে। বইটির প্রত্যক্ষের অনুকূল বইটির সাথে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের যে সংযোগ, তাই এক্ষত্রে ‘ব্যাপার’। চক্ষুরিন্দ্রিয় এই ব্যাপারকে দ্বার করে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষের জনক হওয়ায় চক্ষুরিন্দ্রিয়কেই প্রত্যক্ষের কারণ সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বা সাধকতম কারণ বা করণ বলে অভিহিত করা হয়। তাই এঁরা ব্যাপারবৎ কারণকে করণ বলেন।(ব্যাপারবৎকারণম্ করণম্)

কিন্তু বাৎসায়ন, উদ্যোতকর প্রমুখ প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ ব্যাপারটিকেই সাধকতম বা শ্রেষ্ঠ কারণ বলেন। তাঁরা বলেন, বইটির প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে চক্ষুরিন্দ্রিয় অবশ্যই কারণ, কিন্তু তা গৌণ কারণ। সাধকতম বা মুখ্য কারণ বা করণ হল চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সাথে বইটির সংযোগরূপ সন্নিকর্ষ, যার অব্যবহিত পরে কার্য অবশ্যম্ভাবীরূপে ঘটবেই। এঁরা ফলাযোগব্যবচ্ছিন্নং কারণকে করণ বলেন।(ফলাযোগব্যবচ্ছিন্নং কারণং করণম্) যে কারণ কখনোই ফল বা কার্যের সাথে যোগহীন হয় না বা অন্যান্য কারণ সামগ্রী থাকা সত্ত্বেও যে কারণটি ঘটলেই কার্যটি ঘটে তাই করণ।

একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে উক্ত উভয় মতকে তুলে ধরা যেতে পারে। বৃক্ষচ্ছেদন হল একটি কার্য। এই কার্যের কারণ হল কুঠার এবং ব্যাপার হল বৃক্ষচ্ছেদনানুকূল উৎযমন নিপাতনাদি ক্রিয়া। প্রাচীন নৈয়ায়িকদের মতে, বৃক্ষচ্ছেদনানুকূল উৎযমন নিপাতনাদি ক্রিয়া রূপ ব্যাপারটি সংঘটিত হলেই বৃক্ষচ্ছেদনরূপ কার্যটি সঙ্গে সঙ্গে সম্পাদিত হয়। তাই ব্যাপারটি এক্ষেত্রে করণ। কিন্তু নব্য নৈয়ায়িকগণ বলেন, ব্যাপারের দ্বারা অর্থাৎ বৃক্ষচ্ছেদনানুকূল উৎযমন নিপাতনাদি ক্রিয়ার দ্বারা কারণ অর্থাৎ কুঠারটি বিশিষ্ট (ব্যাপারবৎ) হলে তবে বৃক্ষচ্ছেদন কার্যটি সংঘটিত হয়। তাই তাঁদের মতে ব্যাপারবৎ কারণই করণ।

কিন্তু জয়ন্ত ভট্ট প্রচীন মতানুগ হলেও তিনি কোন একটি কারণকে সাধকতম বা শ্রেষ্ঠ কারণ বলে স্বীকার করতে আগ্রহী নন। তিনি বলেন, অবস্থা বিশেষে অন্যান্য কারণের তুলনায় কর্ম, কর্তা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন কারণও মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়। তিনি একটি দৃষ্টান্ত সহযোগে বিষয়টিকে সহজবোধ্য করার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেন, ধরা যাক্ ঘোর অমানিশার রাত্রি। চারিদিকে সূচীভেদ্য অন্ধকার। আকাশে মেঘের ঘনঘটা। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু এই দুর্যোগপূর্ণ রাত্রে কোন এক পথিক ঐ দুর্গম পথ অতিক্রম করে চলেছেন। চারিদিকে গভীর অন্ধকার তার দৃষ্টিপথ রোধ করে রেখেছে। এরূপ অবস্থায় বিভ্রান্ত পথিক যদি বিদ্যুতের আলোকে তাঁর সম্মুখে পথের কোন মহিলাকে দেখতে পান, তখন পথিকের ঐ মহিলাকে দর্শনের জন্য কোন্ কারণটিকে মুখ্য বলা যাবে? বিদ্যুতের আলোক, পথিকের চক্ষু দুটি, নাকি ঐ দৃশ্যমান মহিলাটি? কেউ হয়তঃ বলতে পারেন, বিদ্যুতের আলোক না থাকলে ঐ মহিলার কোন মতেই দর্শন ঘটত না। তাই বিদ্যুতের আলোকই মহিলাকে দর্শন করার পক্ষে অসাধারণ কারণ।

কিন্তু এক্ষেত্রে আমি বলব বিদ্যুৎই থাকুক, পথিকই থাকুক, কিংবা পথিকের চক্ষুদ্বয়ই থাকুক যদি মহিলাটি ঐ সময় ঐ স্থানে না আসত, তাহলে সহস্র বিদ্যুতের আলোক, পথিক বা পথিকের নেত্রদ্বয় তাকে কিছুতেই দেখতে পেত না। সুতরাং ঐ মহিলা দর্শনে বিদ্যুতের আলোক প্রভৃতি অপেক্ষাও মহিলাটিই বিশেষ সাহায্যকারিণী হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। ফলে দেখা যাচ্ছে বিদ্যুতের আলোক যা একজনের কাছে মুখ্য কারণ বলে প্রতীত হয়, অন্যের কাছে তা গৌণ মনে হতে পারে। এরূপ দৃষ্টিতে বিচার করলে, দেখা যাবে যে, যে সকল কারণ সহযোগে কার্যটি সম্পাদিত হয়, তার মধ্যে কোন্‌টি প্রধান, আর কোন্‌টি অপ্রধান তা নির্ণয় করা কঠিন। এই জন্যই জয়ন্ত ভট্ট বলেন, জগতে কোন একটি কারণ থেকে কার্য উৎপন্ন হতে দেখা যায় না। অনেকগুলি কারণ মিলিতভাবে কার্য উৎপন্ন করে। অনেকগুলি কারণের মধ্যে কোন একটিকে প্রধান, অন্যগুলিকে অপ্রধান বলার কোন যুক্তি সঙ্গত কারণ নাই। কারণ সামগ্রী উপস্থিত হলেই কার্য উৎপত্তি অবশ্যম্ভব হতে দেখা যায়।

যাইহোক্ সাধকতম কারণই প্রমাণ হোক বা কারণ সামগ্রীই প্রমাণ হোক ন্যায় মতে সেই প্রমাণ যে চার প্রকার হবে সে সম্পর্কে কোন নৈয়ায়িকদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নাই। এখন প্রশ্ন হল কোন একটি প্রমেয় বা বিষয়ের যথার্থ জ্ঞানের জন্য কোন একটি প্রমাণই ব্যবস্থিত, না একটি প্রমেয়র জ্ঞানের জন্য একাধিক প্রমাণ অর্থাৎ প্রমাণ সংপ্লব বা সংকর স্বীকার্য। (এক বিষয়ে এক প্রমাণের কার্যকারিতাকে প্রমাণ ব্যবস্থা এবং এক বিষয়ে একাধিক প্রমাণের কার্যকারিতাকে প্রমাণসংপ্লব বলে)।

নৈয়ায়িকদের মতে, একই বিষয়ের জ্ঞান ক্রমশঃ একাধিক প্রমাণের দ্বারা সংঘটিত হতে পারে। যেমন ভাষ্যকার বাৎসায়নের মতে, ‘এই স্থানে আগুন আছে’ - এরূপ জ্ঞান আপ্ত বাক্য বা শব্দ প্রমাণ দ্বারা উৎপন্ন হলে, ঐ বিষয়ে দৃঢ়তর জ্ঞানের জন্য প্রমাতা ক্রমশঃ নিকটবর্তী হয়ে ধূম দেখে অগ্নি অনুমান করেন। পরে আরো নিকটবর্তী হয়ে অগ্নিকে বিশেষরূপে দেখতে পান। অগ্নির প্রত্যক্ষ জ্ঞান হলে পর প্রমাতার যাবতীয় আকাঙ্খার নিবৃত্তি ঘটে। এইভাবে ভাষ্যকার বাৎসায়ন প্রমাণসংপ্লব সংরক্ষণে বলেন, পৃথক পৃথক প্রমেয় যেমন পৃথক পৃথক প্রমাণ দ্বারা বোধ্য, তেমনি ক্ষেত্র বিশেষে পৃথক পৃথক প্রমেয় পৃথক পৃথক প্রমাণের বোধ্য হতে পারে এবং একটি প্রমেয় নানা প্রমাণের বোধ্যও হতে পারে।

এখন নৈয়ায়িকদের মতে, জিজ্ঞাসা বশতঃ একই বিষয়ে সম্ভব হলে ক্রমশঃ শব্দ থেকে প্রত্যক্ষ পর্যন্ত যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তার মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয়(অনুমিতি ও প্রত্যক্ষ) জ্ঞানকে ব্যর্থ বলা যায় না। তাই সম্ভব স্থলে প্রমাণ সংপ্লব অবশ্যই স্বীকার্য। মহর্ষি গৌতমও পরে চতুর্থ অধ্যায়ে দ্বিতীয় আহ্নিকের ২৯ নং সূত্রে ‘‘প্রমাণতশ্চার্থ-প্রতিপত্তেঃ’’ ‘প্রমাণতঃ’ এরূপ পদ প্রয়োগের দ্বারা উক্ত সিদ্ধান্তের(প্রমাণ সংপ্লবের) সূচনা করেছেন বলে টীকাকারদের দাবী।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ